রামকৃষ্ণ সঙ্ঘ এবং স্বামী অখণ্ডানন্দ

স্বামী বিমলাত্মানন্দ

অবতারের সাধনা জীবকল্যাণেই অনুষ্ঠিত হয়। এর ফলে আধ্যাত্মিক রাজ্যে আলোর বন্যা প্রবাহিত হয়, মানুষ নতুন দিশা পায়, নতুন আলোক পায় এবং ঈশ্বরমুখী হয়। সংসার-কেল্লা থেকেও তার ঈশ্বরদর্শন হয়, আর সংসারবিমুখ মানব আধ্যাত্মিক আলোকে আলোকিত হয়। অবতারের এইটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য। শ্রীরামকৃষ্ণদেবও এর ব্যতিক্রম নন—তার প্রমাণ তাঁর জীবন। 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ'কার বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে সবিস্তারে আলোচনা করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন।

মা জগদম্বার ইচ্ছায় শ্রীরামকৃষ্ণ সর্ববিধ সাধন করে জগৎকল্যাণের কাজটি আরম্ভ করলেন। তিনি একে বলতেন 'মায়ের কাজ'। মা তাঁকে দেখিয়ে দিলেন তাঁর কাজের ধারা ও রূপ। এই 'মায়ের কাজ' পরবর্তী কালে সঙ্ঘের রূপ নিয়েছিল, যদিও শ্রীরামকৃষ্ণ সরাসরি 'সঙ্ঘ' শব্দ ব্যবহার করেননি।

বারো বছরের সাধনার পর শ্রীরামকৃষ্ণের অসাধারণ কয়েকটি উপলব্ধি হয়েছিল।[১] প্রথমত সব ধর্ম সত্য—যত মত তত পথ। দ্বিতীয়ত দ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত ও অদ্বৈতমত পরস্পরবিরোধী নয়। এগুলি সাধকের জীবনে আধ্যাত্মিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে স্বাভাবিকভাবেই আসে। তবে শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন, ''অদ্বৈতভাবই শেষ কথা জানবি।'' অদ্বৈতভাব বাক্যমনাতীত উপলব্ধির বিষয়। তৃতীয়ত মা জগদম্বার হাতের যন্ত্রস্বরূপ হয়ে তাঁর নিজের জীবনে যে-উদার মত বিকশিত হয়েছে, তাকে অবলম্বন করে 'বিশেষভাবে অধিকারী নব সম্প্রদায়' তাঁকে প্রবর্তিত করতে হবে। স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজ ব্যাখ্যা করেছেন এই নব সম্প্রদায়ের অর্থ : ''সর্বতোভাবে অসম্প্রদায়িক সম্প্রদায় বা সংস্থা। এটিকে সম্প্রদায় বলা হচ্ছে এই অর্থে যে, এই মতবাদের বহু অনুগামী আছেন; আবার অসাম্প্রদায়িক এই অর্থে যে, এঁরা নিজেদের কখনো একটি বিশেষ গণ্ডির মধ্যে বিশেষ কোনো বহিরঙ্গ সাধনের মধ্যে আবদ্ধ রাখেন না। এঁদের সকলেরই জীবনের একমাত্র লক্ষ্য ঈশ্বরলাভ এবং একটিই আদর্শ যা কোনো ব্যক্তি বা ধর্মমত সম্বন্ধে বিদ্বেষভাব পোষণ করবে না, কোনো ধর্মসম্প্রদায়ের বিরুদ্ধাচরণ করবে না।''[২]

চতুর্থত কর্মযোগ অবলম্বনে সাধারণ মানুষের উন্নতি হবে। পঞ্চমত যাদের শেষ জন্ম, তারাই তাঁর কাছে আসবে ধর্মলাভ করতে। শ্রীরামকৃষ্ণের এসব উপলব্ধি সঙ্ঘের মাধ্যমেই সমগ্র জগতে প্রচারিত ও প্রসারিত হবে। তাই শ্রীরামকৃষ্ণ নিয়ে এলেন

দু-ধরনের মানুষকে। একদল শুদ্ধসত্ত্ব ত্যাগী যুবক, আর একদল শিক্ষিত সমাজের বিভিন্ন স্তরের বিভিন্ন পেশার মানুষ—বয়স্ক ও গৃহস্থ। শ্রীরামকৃষ্ণ মধ্যমণি হয়ে এই দুধরনের মানুষের কাঁধে ভার দিয়ে সঙ্ঘের ভিত গড়লেন। এঁরাই সঙ্ঘের দুটি স্তম্ভ।

শ্রীরামকৃষ্ণ স্বামীজীকে পাঠ দিয়েছিলেন অদ্বৈতভাবে। রাজা মহারাজ সম্বন্ধে বলেছিলেন, ''ও একটা রাজ্য চালাতে পারে।'' কারও কোলে বসে পরখ করে নিলেন তিনি কতটা ভার বইতে পারেন। কাউকে দর্শন করিয়ে দিলেন মা জগদম্বার পদতলে শায়িত জীবন্ত শিব। তাঁকে যে শিবজ্ঞানে জীবসেবাব্রতের সূচনা করে যেতে হবে! তিনি হলেন স্বামী অখণ্ডানন্দজী মহারাজ।

শ্রীরামকৃষ্ণের ষোলোজন ত্যাগী পার্ষদ তাঁর উপলব্ধিগুলি নিজেদের জীবনে রূপায়িত করেছেন এবং জগতের কাছে বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। স্বামী অখণ্ডানন্দজী তাঁদের অন্যতম।

রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠার পর স্বামীজীর আহ্বানে প্রথম এগিয়ে এসেছিলেন স্বামীজীর অত্যন্ত প্রিয় 'গ্যাঞ্জেস'—স্বামী অখণ্ডানন্দজী। মিশন প্রতিষ্ঠার মাত্র পনেরো দিনের মধ্যে তিনি মুর্শিদাবাদের মহুলায় প্রথম রিলিফ কাজ আরম্ভ করেছিলেন। রিলিফের পর অনাথ আশ্রমকে কেন্দ্র করে সারগাছি রামকৃষ্ণ মিশন গড়ে উঠল সেবাকাজের বিস্তারের জন্য। তিনি এই এলাকার মানুষের সেবায় নিজের জীবন উৎসর্গ করেছিলেন।

অখণ্ডানন্দজী বিভিন্ন সময়ে সাধু-ব্রহ্মচারী, ভক্তদের সঙ্গে রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করতেন, চিঠিতেও লিখতেন। তাঁর কাছে শুনেও অনেকে সেসব লিখে রেখেছেন। এগুলি আমরা একত্রে সন্নিবেশিত করার চেষ্টা করছি।

রামকৃষ্ণ সঙ্ঘ আনুষ্ঠানিকভাবে প্রতিষ্ঠার আগেই, ১৮৯৪ সালে অখণ্ডানন্দজী সঙ্ঘের ভাবাদর্শে নরনারায়ণসেবা করেন রাজস্থানের খেতড়িতে। খেতড়িরাজ অজিত সিং-এর অতিথিনিবাসে থাকার সময় তিনি বহু গ্রাম ঘুরে দেখেছিলেন দরিদ্র প্রজাদের চরম দুর্দশা, অন্নবস্ত্রের অভাব, অস্বাস্থ্যকর আলোবাতাসহীন বাড়িঘর, অশিক্ষা, অপরিকল্পিত চাষবাস। অখণ্ডানন্দজীর হৃদয় কেঁদে উঠল। সব জানিয়ে স্বামীজীকে চিঠি লিখে ইতিকর্তব্যের নির্দেশ চাইলেন। দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর স্বামীজীর নির্দেশ এল (জুন ১৮৯৪) : ''কার্য করিতে হইবে..., খেতড়ি শহরের গরীব নীচজাতিদের ঘরে ঘরে গিয়া ধর্ম উপদেশ করিবে।... মধ্যে মধ্যে অন্য অন্য গ্রামে যাও, উপদেশ কর, বিদ্যাশিক্ষা দাও। কর্ম, উপাসনা, জ্ঞান—এই কর্ম কর,... গেরুয়া কাপড় ভোগের জন্য নহে, মহাকার্যের নিশান—কায়মনোবাক্য 'জগদ্ধিতায়' দিতে হইবে। পড়েছ, 'মাতৃদেবো ভব, পিতৃদেবো ভব'; আমি বলি, 'দরিদ্রদেবো ভব, মূর্খদেবো ভব'। দরিদ্র, মূর্খ, অজ্ঞানী, কাতর—ইহারাই তোমার দেবতা হউক, ইহাদের সেবাই পরম ধর্ম জানিবে।'' খেতড়িতে তিনি কী না করেছিলেন —বিদ্যালয় স্থাপন, চিকিৎসা সেবা, কৃষির উন্নতি —সব।[৩]

অখণ্ডানন্দজী স্বামীজীর এই নির্দেশকে রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের আদর্শ বলে মনে-প্রাণে গ্রহণ করলেন। সেই যে দক্ষিণেশ্বরে 'চৈতন্যময় শিব' দেখেছিলেন, তাঁর কাছে 'দরিদ্র, মূর্খ' জনসাধারণ ছিল সেই শিব। 'আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ'—সঙ্ঘের এই আদর্শকে অবলম্বন করে সারা জীবন জনগণের সেবায় তিনি শিবসেবাজ্ঞানে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। জনৈক সন্ন্যাসী সঙ্ঘ-প্রসঙ্গে অখণ্ডানন্দ-জীবনের ব্যাখ্যা দিয়েছেন সুন্দরভাবে : ''ঠাকুরের এই সন্তান একাধারে ছিলেন ভক্তিযোগী ও কর্মযোগী! ঘুম ও চুপচাপ বসে থাকার মহাশত্রু ছিলেন তিনি! কর্ম, কর্ম—কেবল কর্ম! তবে নূতনভাবে কর্ম করতে হবে—কর্ম মানে পূজা!

সকামভাবে নয়—নিষ্কামভাবে, সেবার ভাবে, উপাসনার ভাবে। নিজের জীবনে আচরণ করে দেখিয়ে গেলেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের এই সন্তানের জীবনরূপ গ্রন্থের পৃষ্ঠা আমরা যত উল্টাব—ততই দেখতে পাব, তিনি ছিলেন—গীতার নিষ্কাম কর্ম-যোগের—অনাসক্তি-যোগের মূর্তিমান বিগ্রহ! তাঁর জীবন ছিল নবতম সেবাধর্মের বিশাল স্তম্ভস্বরূপ।"[৪]

স্বামী অখণ্ডানন্দজী তাঁর 'স্মৃতিকথা' পুস্তিকায় রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের ভাবাদর্শ সুস্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করেছেন নিজ স্বাক্ষরিত ভূমিকায় : ''রামকৃষ্ণ মিশনের পূর্বে আর কেহ বা কোন সম্প্রদায়ই বাঙলা ও সমগ্র ভারতবর্ষকে এমন ব্যাপক, স্বার্থশূন্য ও পূজার ভাবে এই মহান জনসেবাব্রতে দীক্ষিত করেন নাই। স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহার নিঃসীম উদার প্রেমপূর্ণ হৃদয় হইতে উত্থিত সেবাব্রতের অমোঘ মন্ত্রের ভাবগঙ্গাপ্রবাহে পাশ্চাত্য প্লাবিত করিয়া যখন বিজয়শঙ্খ-নাদ করিতে করিতে সেই সুরধুনী-প্রবাহকে ভগীরথের মতোই ভারতবক্ষে আনয়ন করিলেন, তখন এই ক্ষুদ্র হৃদয়-তটিনী সেই অপূর্ব ভাবোচ্ছ্বাসে কিরূপ উচ্ছ্বসিত উদ্বেলিত হইয়া উঠিয়াছিল, কিরূপে এই ক্ষুদ্র জীবনের কর্মশক্তিমুখে সেই ভাবতরঙ্গ সেদিনকার সেই অবজ্ঞাত বিপন্ন বাঙলার দুর্ভিক্ষ-ক্লেশমোচনকার্যে প্রবাহিত হইয়াছিল, নিরন্ন মুর্শিদাবাদবাসী বাঙালী কৃষককুলের বিষণ্ণমুখে সেদিন মা অন্নপূর্ণার প্রসাদে কি অপরূপ তৃপ্তি ও ভরসার হাসিরেখা ফুটিয়া উঠিয়াছিল, আজ তাহারই ক্রমিক ও বিস্তৃত বিবরণ প্রকাশ করিবার প্রয়োজন বোধ করিতেছি। কারণ, কিছুদিন যাবৎ রামকৃষ্ণ-সংঘের ইতিবৃত্ত-সংগ্রহে ও ইতিহাস রচনায় নানা লোককেই নানাভাবে নিযুক্ত দেখিয়া আসিতেছি। এবং অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় এই যে, ঐ-সকল বিভিন্ন ব্যক্তির রচনায় নানারূপ বৈষম্য ও সত্যের অপলাপ পরিলক্ষিত হইতেছে। এই সকল ভ্রান্তি ও মিথ্যা সংশোধনের জন্যই আমার জ্ঞাত এবং কৃত কর্মের নির্ভুল বিবরণ আমার জীবিতকালেই প্রকাশ করা কর্তব্য বলিয়া বোধ করিতেছি।"[৫]

অখণ্ডানন্দজী সারগাছিতে থাকতে চোখের জলে শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে কাতরভাবে প্রার্থনা করতেন যেন কোনও কাজই তাঁর ছোট বলে মনে না হয়। ভাবই আসল। তিনি বলতেন, ''ঠাকুর, আমি একজন নগণ্য সন্ন্যাসী; বাঙলার এক নিভৃত গ্রামের অখ্যাত অজ্ঞাত কোণে বসিয়া সমস্ত দিনে এই যে এতটুকু কাপড় উৎপন্ন করিলাম, ইহাতেও দরিদ্র ৩৩ কোটি ভারতবাসীর নগ্নাবস্থা কিছু দূর হইবে, সকলে যেন ইহা বুঝিয়া কাজ করে।"[৬]

এটিও রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের আদর্শ। জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ সবই করতে হবে, কোনও কাজই ছোট নয়। মন্দিরে শ্রীশ্রীঠাকুরের সেবাপূজা, ঘরদোর ও বাথরুম পরিষ্কার করা, গোশালা-বাগান-ভাণ্ডার-বাজার করা, চাঁদা ভিক্ষা করা, স্কুল-কলেজ-ইউনিভার্সিটিতে পড়ানো—সব কাজই সমান। রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের আদর্শ—যেকোনও কাজ সঠিক ভাব নিয়ে করলেই ঈশ্বরদর্শন হবে।

অখণ্ডানন্দজী আরও প্রার্থনা করতেন : ''ঠাকুর, আমাকে যদি দেশের ও দশের উপকার করিতে হয়, তবে সেজন্য আমাকে যেন কখন (ধনগর্বে গর্বিত) ধনীদিগের দ্বারস্থ হইতে না হয়।"[৭] রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের বিপুল সেবাকাজের সিংহভাগ অর্থ আসে ভক্ত, অনুরাগী ও জনসাধারণের কাছ থেকে। যাদের অর্থ আছে, তাদের অন্তর থেকে স্বতঃস্ফূর্ত তাগিদ আসতে হবে সেবাকাজের জন্য অনুদান দিতে, তাদের কাছে চাইতে হবে না। অখণ্ডানন্দজী নিজেই তার উদাহরণ। প্রসঙ্গত, শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছিলেন শ্রীশ্রীমাকে : ''কারও কাছে চিত হাত করো না।"

শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন, ''অদ্বৈত জ্ঞান আঁচলে বেঁধে যা ইচ্ছে কর।" সঙ্ঘের এই আদর্শের অনুপম

ব্যাখ্যা পাই অখণ্ডানন্দজীর কাছে : ''যে মানুষ একটী দেহে থাকে, সে মুক্তিলাভ করিলে মনে করে—সে সকলের মধ্যে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। সন্ন্যাসী হইলে একটা অসাধারণ কিছু হয় না, সন্ন্যাসীর মনে হয়—অপরের অনাহারে তিনি অনাহারী থাকিয়া ক্ষুধার তাড়নাভোগ করিতেছেন, অপরের কষ্ট তাঁহারই নিজের কষ্ট। যখন দশজন লোক বসিয়া আহার করে, তখন তাঁহার মনে হয়—তিনি স্বয়ং আহারে যে আনন্দলাভ করিতেন, তদপেক্ষা দশগুণ অধিক আনন্দলাভ করিতেছেন—কারণ, সেই দশ জনের মধ্যে তিনি দশগুণে বিদ্যমান, আর নিজদেহ মাত্র একক।''[৮]

শ্রীরামকৃষ্ণ মহোৎসবের প্রসাদের অধিকারী সকলেই। অখণ্ডানন্দজী মহারাজ তাঁর 'স্মৃতিকথা'য় ১৮৯৬ সালে দক্ষিণেশ্বরে মহোৎসবের প্রসাদ বিতরণের বিবরণ দিয়েছেন। মহোৎসবের প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন গৃহী ভক্তেরা। প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়, গিরিশবাবু, দানাকালী প্রমুখ মহা উৎসাহে প্রসাদের ব্যবস্থা করেন। প্রিয়নাথবাবু বলরাম মন্দিরে স্বামী ব্রহ্মানন্দজী ও যোগানন্দজীর সামনে প্রসাদের মেনু ঠিক করলেন : দরিদ্র নরনারায়ণদের জন্য কলায়ের ডালের ঢালা খিচুড়ি এবং ভদ্রলোকদের জন্য পাঁচমণ সোনামুগের ডাল ও বাঁকতুলসি ডালের ভুনি খিচুড়ি হবে। এই মেনু শুনে মঠের সবার আপত্তি। অখণ্ডানন্দজী তখন সেখানে ছিলেন। তিনি বললেন, ''ঠাকুরের প্রসাদে সকলেই সমান অধিকারী। ঠাকুরের দরবারে ছোট-বড় ইতর-ভদ্রের ভেদাভেদ নেই।'' তিনি রাজা মহারাজের কাছে ছুটলেন। বললেন, ''রাজা, তুমি নাকি প্রসাদের দু-রকম ব্যবস্থার অনুমোদন করেছ।'' রাজা মহারাজের উত্তর : ''গৃহী ভক্তরা এখানে ঐরকম বলাবলি করছিলেন। কিন্তু আমি 'হ্যাঁ-না'র মধ্যে ছিলাম না। তোমাদের প্রস্তাবমত সকলের জন্যই ভুনি খিচুড়ির ব্যবস্থা হবে।''[৯] অখণ্ডানন্দজী আনন্দে উৎফুল্ল হলেন। সেই থেকে ঠাকুরের মহোৎসবে সবার জন্য একইরকম খিচুড়ির ব্যবস্থা। সঙ্ঘের সব উৎসবে খিচুড়ি-প্রসাদের বিতরণ ব্যবস্থা এভাবে হয়ে আসছে। বেলুড় মঠে উৎসবে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ, সাহিত্যিক-সাংবাদিক সুরেশচন্দ্র মজুমদার প্রমুখ সাধারণের পঙ্গতে বসে একই প্রসাদ পেতেন। তখনকার দিনে অল্প লোক হত বলে পঙ্গতে বসিয়ে খাওয়ানো হত। বর্তমানে ভক্তসংখ্যা বিপুল পরিমাণ বেড়ে যাওয়ায় হাতে হাতে প্লেট ভরে সবজি সমেত খিচুড়ি, চাটনি, বোঁদে, পায়েস প্রসাদ বিতরণ করা হয়। রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের এই ঐতিহ্য স্বামী অখণ্ডানন্দজী মহারাজের হাত ধরে আরম্ভ হয়েছিল, যা এখনও চলছে।

অখণ্ডানন্দজী আর-একটি দৃষ্টিভঙ্গি আমাদের দিয়েছেন : ''মহোৎসব হচ্ছে, আশ্রমের সামনে বড় রাস্তায় শত শত ক্ষুধাতুর নরনারী পাতা নিয়ে বসে গেছে। এদিকে খিচুড়ি আর বেরুচ্ছে না; ওদিকে ঠাকুরের প্রতিকৃতির সামনে ভোগ দেওয়া হচ্ছে। দেরি দেখে ঠাকুর বলছেন, 'ওরে ঐ যে সব পাতা নিয়ে বসে আছে, ওরা সব খাবার জন্য হাঁ করে রয়েছে, ওদের মুখেই যে খাব। ঐ পাতায় আমায় ভোগ দে।' ঠাকুরকে এই কথা বলতে শুনে যারা খিচুড়ি আনতে দেরী করছে, তাদের তাড়া দিলাম। এর পরেই সকলে তাড়াতাড়ি পরিবেশন শুরু করে দিল। খিচুড়ি পাতে পড়তে না পড়তে সবাই খেয়ে ফেলতে লাগল।''[১০]

তখন সারগাছিতে মন্দির ছিল না। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ছবি রেখে পূজা-ভোগাদি হত। এখন মন্দির হয়েছে, মন্দিরে ভোগ হয়। তবু অখণ্ডানন্দজীর ওই কথা স্মরণ করে উৎসবের দিন খিচুড়ি বিতরণস্থানে শ্রীশ্রীঠাকুরকে খিচুড়ি নিবেদন করে বিতরণ করা হয়। একে বলে 'বিরাট ভোগ'।

স্বামী অখণ্ডানন্দজী বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন জনের প্রশ্নের উত্তরে সঙ্ঘের ভাবাদর্শ ব্যাখ্যা করতেন।

এগুলি বিভিন্ন সময়ে 'উদ্বোধন' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। এরকম কয়েকটি উক্তি :

''কাজের জন্যই স্বামীজী এসব মঠ-মিশন করে গেলেন, তা যদি না হবে তো যাবার দিনেও স্বামীজী এত কাজ করে গেলেন কেন?... কই হাত পা গুটিয়ে বসে রইলেন না। বহুমূত্র অসুখ, পরিশ্রান্ত, কিন্তু সেদিনও দেড় মাইল বেড়িয়ে এলেন। ব্যাকরণের ক্লাস করলেন, সাধুদের বকলেন, কাজ-কর্ম না করার দরুণ। বললেন, 'তোরা ঘুমোবি বলে মঠ হল নাকি?' শেষে ধ্যানে বসলেন। সেদিন যেন কাজের জোয়ার এসেছিল।''[১১]

''আসল কথা নিজেকে বিলিয়ে দিবি। পরের জন্য প্রাণ পর্যন্ত বিসর্জন করতে কুণ্ঠিত হবি না। আর শ্রদ্ধা সহকারে সমস্ত কাজ করবি। শ্রদ্ধা না হলে কিছুই হবে না। শ্রদ্ধা মানুষকে অমর করে। শ্রদ্ধা থেকে প্রেম, করুণা, ভালবাসা, দয়া—আত্মজ্ঞান পর্যন্ত লাভ হয়, আত্মার সাক্ষাৎকার হয়। শ্রদ্ধা না থাকলে কিছুই হয় না। ঠাকুরের উপর নির্ভর করে পড়ে থাক, সব হয়ে যাবে।''[১২]

''একটু কাজ করেই ভাববে না যে, আমি একটা কিছু করে ফেলেছি। তাহলে তুমি ছোট হয়ে যাবে। যত তুমি মনে করবে কিছুই করিনি, ততই তোমার শক্তি বৃদ্ধি হবে। শরীর মন সর্বদা পবিত্র রাখবে। তবেই শক্তি বাড়বে।''[১৩]

''পরোপকারে কাহার উপকার?—আমার নিজের—এইতো স্বামীজীর কর্মযোগ—সেবাধর্ম। ... সেবায় চিত্তশুদ্ধি, সেবায় হৃদয়ের বিস্তার, সেবায় সর্বভূতে আত্মদর্শন। আত্মজ্ঞান হলে পর বিশ্বপ্রেম। তখন বোঝা যায় সেই অনুভূতি—'ব্রহ্ম হতে কীট পরমাণু—সর্বভূতে সেই প্রেমময়'!''[১৪]

''যে কাজ তোমরা করছ, এ কাজ আমার নয়, শ্রীশ্রীঠাকুরের। এর দ্বারা তুমি কারও উপকার করছ না, তোমার নিজেরই কাজ হচ্ছে। আমার কাছে কাজই ধর্ম। এ ঠাকুরের কাজ, কত মহান, কত পবিত্র—এই ভাব নিয়ে যদি কিছু করতে পার, তা হলেই হবে। নচেৎ গঙ্গাজলের কলসীতে এক ফোঁটা কুয়োর জল পড়লে যেমন কলসীসুদ্ধ জল নষ্ট হয়ে যায়, সেই রকম তোমাদের সব কাজ সর্বৈব মিথ্যা হয়ে যাবে।''[১৫]

রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের ভাবধারা ও আদর্শ সম্বন্ধে স্বামী অখণ্ডানন্দজী নিজের অনুভূতির কথা বিস্তৃতভাবে ব্যক্ত করেছেন কাশীর জমিদার প্রমদাদাস মিত্রকে লেখা চিঠিতে (১৯ অক্টোবর ১৮৯৮) : ''... যে মানুষকে ত্যাগ করিয়া একদিন আমি হিমালয়ের উচ্চ২ [উচ্চ উচ্চ] পর্ব্বতশ্রেণীর মস্তকে২ [মস্তকে মস্তকে] বেড়াইয়া বেড়াইতাম, সেই আমি মনুষ্যেই সাক্ষাৎ ভগবানকে দেখিতেছি! এবং মনুষ্যসমাজের সেবাই তাঁহার সেবা। ভগবান স্বয়ং যেন আসিয়া আমার কানে২ [কানে কানে] বলিতেছেন যে, ওরে! এই মানুষই বৈদিক মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ও রাম-কৃষ্ণাদি অবতার—এই মানুষই সব!!! এই মনুষ্যসমাজের চরমোন্নতির সময়েই আমরা এই মনুষ্যের মধ্যেই রাম-কৃষ্ণাদি অবতার দেখিতে পাই। সেই মনুষ্যসমাজের হীনাবস্থা উপস্থিত হইলে তাহার উন্নতিকল্পে মনুষ্যমাত্রেরই প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করা কর্ত্তব্য।...

''বহু জীবনের কল্যাণ সাধন করিতে করিতে স্বীয় আধ্যাত্মিক জীবনের পুষ্টিসাধন ভিন্ন কোন ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা নাই। আত্মজ্ঞান লাভ করিতে হইলে নির্জন-সেবা প্রভৃতি করিতে হয় বটে, কিন্তু তাহা কি চিরকালই করিবে। মানুষ যতই আত্মবিস্তার লাভ করিবে, ততই তাহার হৃদয় কোমল ও সরল হইবে। জীবসেবা করিলে শমদমাদি ভূষণ আরও অধিকতর উজ্জ্বল হয়—নিষ্কাম কর্মানুষ্ঠান যে করে তার। ইহা যে অমুক করিবে—আর অমুক করিবে না—এরূপ বাঁধাবাঁধি হওয়া অসম্ভব। কারণ 'যাবৎ শরীর তাবৎ ক্রিয়া', অতএব যে ক্রিয়া নিষ্কাম হওয়া চাই এবং আত্মজ্ঞানী সহস্র কার্য করিয়াও স্বয়ং নিষ্ক্রিয়

থাকেন—এ নিগূঢ় তত্ত্ব মায়ামুগ্ধ সংসারী জীবের বুঝিবার সাধ্য নাই। ইহা সেই সৎকর্মনিষ্ঠ আত্মজ্ঞানী পুরুষেরই হৃদয়ে লুক্কায়িত আছে।"[১৬] এই চিঠি রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের ঐতিহাসিক দলিল।

সঙ্ঘের সাধু-ব্রহ্মচারী ও কর্মীদের অখণ্ডানন্দজী বলতেন, ''যাহা রয় সয়, তাহাই করা উচিত। আমার একটি কথা সর্বদা মনে রাখিও—অকপট ও শুদ্ধভাবে শ্রীশ্রীঠাকুরের কাজ খুব আনন্দ-সহকারে খুব যত্ন করে যে করে, সে কেবল নিজের কল্যাণ করে না, প্রত্যুত দশের কল্যাণ করিয়া ধন্য হয়। এই কর্মের শেষ নাই।"[১৭]

১৯২৬ সালে অনুষ্ঠিত রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের মহাসম্মেলনের শেষদিনের সভায় সভাপতিরূপে অখণ্ডানন্দজী মহারাজ সঙ্ঘের ভাব ও আদর্শ অতি সুস্পষ্ট ভাষায় তুলে ধরেছিলেন : ''যদি কেহ সরল হইত, শ্রীরামকৃষ্ণ কখনও তাহাকে তাহার ধর্মমতের জন্য নিন্দা করিতেন না। যে যেখানে আছে, সেখান হইতে তিনি তাহাকে তাহারই পথে আগাইয়া দিতেন। তিনি সকল ধর্মমতের কথাই শুনিতেন, এবং সরল, সত্যবাদী ও যথার্থ বিশ্বাসীর উপর তাঁহার কৃপা বর্ষিত হইত। যদি কোনও কিছুর তিনি নিন্দা করিতেন, তাহা কপটতা বা ভণ্ডামির।

''স্বামী বিবেকানন্দের ভিতরও সকলের প্রতি সহানুভূতি দেখিয়াছি।... শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দ প্রকৃতপক্ষে একই আত্মা, যেন যুগ্ম ব্যক্তিত্বের মধ্য দিয়া প্রকাশিত! শ্রীরামকৃষ্ণে যা বীজভূত, স্বামীজীতে তাহাই অঙ্কুরিত! স্বামীজী যেন শ্রীরামকৃষ্ণ-রূপ বেদান্তসূত্রের ভাষ্য! উভয়ে পরিপূরক, অবিচ্ছেদ্য, টাকার এপিঠ-ওপিঠ। শ্রীরামকৃষ্ণ যেন ভাবের সমুদ্র, যে কেহ তাঁহার নিকট যাইত, নিজের শক্তি ও ধারণা অনুযায়ী সে পূর্ণ হইয়া আসিত। শ্রীগুরু মহারাজ ও স্বামীজীর প্রিয় ভাবসমূহ যদি আমরা সর্বদা মনে রাখিতে পারি, তবে আমরা নিজেদের সর্বপ্রকার সাম্প্রদায়িক ভাব, গোঁড়ামি ও পরমত-অসহিষ্ণুতার হাত হইতে মুক্ত হইতে পারিব।"[১৮]

স্বামী শিবানন্দজী মহারাজ শয্যাশায়ী। অখণ্ডানন্দজী তাঁকে বেলুড় মঠে দেখতে এসে ছমাস মঠে থেকে গেলেন। প্রতিদিন ভোরে তিনি ঠাকুরঘরে ধ্যানে বসতেন। একদিন ওই সময় তিনি শ্রীশ্রীঠাকুরের কণ্ঠস্বর শুনতে পেলেন : ''গঙ্গা! গঙ্গা! সাধুরা সব আসে না কেন?" এই বাণী তিনি দু-তিন বার শুনতে পেলেন এবং সাধুদের জানালেন।[১৯] সঙ্ঘের সকলকে মনে রাখতে হবে যে, 'জগদ্ধিতায়' করতে গিয়ে যেন 'আত্মনো মোক্ষার্থং' বাদ না পড়ে। এসব ভাব অবলম্বন করে থাকলে সঙ্ঘজীবনের অনেক সমস্যা দূর হয়।

সঙ্ঘের প্রয়োজনীয় কাজের জন্য সংশ্লিষ্ট ফান্ডে টাকা না থাকলে আমরা অনেক সময় ঋণ করে থাকি। পরে চুক্তিমতো পরিশোধ করা হয়। সেই সময়ে বেলুড় মঠে 'সোনার বাগান' (বর্তমানে 'লেগেট হাউস') কেনার জন্য ঋণ নেওয়া সাব্যস্ত হয়। সঙ্ঘাধ্যক্ষ অখণ্ডানন্দজী মহারাজের মতামত জানতে চান স্বামী বিরজানন্দজী। তিনি চিঠিতে জানালেন (৯।৬।১৯৩০) : ''মঠের চৌহদ্দিতে থাকায় 'সোনার বাগান' মঠের শামিল হওয়া যেমন একান্ত বাঞ্ছনীয়, অন্যপক্ষে ঋণ ভারগ্রস্ত মঠের

পক্ষে পুনরায় অতগুলা টাকা ঋণ করিয়া উহা কেনাও অবিধেয়। ধার করিয়া বাড়ী কিনিলে মঠের আদর্শ ক্ষুণ্ণ হইবে এবং পরে অনেকেই নজির দেখাইয়া ঐরূপ... কার্য্য করিতে স্বতঃই প্রবৃত্ত হইবে।... খরচার টাকা হইতেও যদি এক বৎসরের মধ্যে ঋণ পরিশোধ করিবার পক্ষে কোনওরূপ বাধা বিপত্তি না থাকে তাহা হইলেও ভরসা হয়।

''ইহার একটাও যদি সম্ভব না হয় তো অতগুলা টাকা অনিশ্চিতের ভরসায় ঋণ করিয়া কিনিবার পক্ষে মত দিতে পারি না।''[২০]

তবে মঠকে 'সোনার বাগান' কেনার জন্য ঋণ করতে হয়নি। এজন্য মিসেস লেগেট প্রয়োজনীয় অর্থ দিয়েছিলেন। তাই তার নাম হয় লেগেট হাউস।

আশ্রমে কীভাবে থাকতে হবে, সে-সম্বন্ধে সঙ্ঘের ভাবটি অখণ্ডানন্দজী জনৈক সন্ন্যাসীকে লিখেছেন (৩০ জুন ১৯৩২) : '' 'কোণে, বনে আর মনে' তুমি যেখানেই থাক, 'কোণ' ও 'মনের' অভাব হইবে না। 'বনে' গিয়া সাধন ভজন করিবার মত অবস্থা তোমার নয়। তারপর যে কোন আশ্রমে থাকিয়া, তুমি যাহাই কর না কেন, সবই তো—ঠাকুরের ঈপ্সিত কার্য! ঠাকুরের ইচ্ছাতেই তুমি ঘুরিয়া বেড়াইতেছ। তিনিই তোমাকে ঐখানে আনিয়াছেন। ঐ আশ্রমে, তোমার ষোল আনা মনপ্রাণ ঢালিয়া যে সকল কার্য্য করিবে, তাহাতেই তাঁহারই ইচ্ছা পূর্ণ হইবে এবং তাঁহারই আরাধনা হইবে। এইরূপ শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসের সহিত যদি তুমি এখনও ঐরূপ কার্য্য না কর, তাহা হইলে 'হায় হায় গেল গেল!' করিতে২ [করিতে করিতে] পরে তোমার 'ইতো নষ্টস্ততো ভ্রষ্টঃ' হইবারই খুব সম্ভাবনা আছে। শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকট যদি তুমি অকপটে তোমার অভীষ্ট সাধনের জন্য প্রার্থনা করিতে পার তো দেখিবে যে, চকিতেও অদ্ভুত রকমে তাহা সুসিদ্ধ হইয়া যাইবে!!''[২১]

স্বামীজীর নির্দেশ : ''শাকের কড়ি মাছে দিবে না।'' যে-উদ্দেশ্যে সঙ্ঘ অর্থ পায়, সেই উদ্দেশ্যেই তা ব্যয় করতে হবে। একবার জনৈক সাধু রিলিফ ফান্ডের টাকায় তীর্থদর্শন করতে গেলে অখণ্ডানন্দজী একটি চিঠিতে বিরজানন্দজীকে সেই সংবাদ জানিয়ে লেখেন (১২।১০।১৯৩৪) : ''তীর্থ ভ্রমণের টাকাটা আদায় করিতে তুমি নিশ্চয়ই পশ্চাৎপদ হইবে না।''[২২]

সঙ্ঘের যোগসমন্বয়ের আদর্শ ব্যাখ্যা করে অখণ্ডানন্দজী বলেছেন, ''বর্তমান যুগধর্ম সকল যুগধর্মের সমন্বয়—জ্ঞান, ভক্তি ও কর্মের। জ্ঞান চাই, ভক্তি চাই, কর্ম চাই। শুধু একটি হলে চলবে না—সব চাই, সব চাই। ঠাকুর-স্বামীজীর পরিপূর্ণ আদর্শ। ঐ জ্বলন্ত আদর্শ জীবনের সামনে রেখে যেতে হবে।''[২৩]

সঙ্ঘের সব কাজই ঠাকুরের সেবা। এ-সম্বন্ধে অখণ্ডানন্দজী উদাহরণ দিয়ে বললেন, ''উদ্বোধনের সত্যেন (স্বামী আত্মবোধানন্দ) তখন অদ্বৈত আশ্রমের বই বিক্রী করত কলেজ স্ট্রীটে। বেলা দশটায় খেয়ে যেত দুটি ভাতে-ভাত—আর সারাদিন দোকানে থাকত। মনে ভারী কষ্ট—'একি করছি?' একদিন দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে এইসা লেকচার দিলুম যে, এখনও বলে—'মহারাজ, সেই যা inspiration পেয়েছি, তার জোরে এখনও চলেছি।' বলেছিলাম—'এ কি তুমি সোজা কাজ করছ? এর ভেতর কত ত্যাগ, কত তপস্যা, কত সেবা রয়েছে। এই তো ঠিক ঠিক সাধন! সকালে যা হোক দুটি খেয়ে আসো, আর সবাই কত কি খায়!—এই তো ত্যাগ। তারপর এই ছোট্ট একটি ঘর—সারাটা দিন এক জায়গায় স্থির হয়ে বসে থাকা বা থাকতে পারা—এই তো তপস্যা। তারপর এইসব বই থেকে ঠাকুর-স্বামীজীর ভাব প্রচার হচ্ছে কত লোকের ভেতর—তোমার হাত দিয়েই তো তা যাচ্ছে। এ কি কম ঠাকুরের সেবা? ঠাকুরঘরের কাজই কি ঠাকুরের সেবা?' ''[২৪]

সঙ্ঘের হিসাব প্রসঙ্গে অখণ্ডানন্দজীর উক্তি : ''এখন যখন ঠাকুরের কাজ, একটি পাই পয়সারও হিসাব রাখতে হবে, এ Public money। সাধুদের হাতেই যখন এসব কাজ এসে পড়েছে, তখন দেখাতে হবে কাকে অনাসক্ত কর্ম বলে। একটি পয়সা দাম কমাবার জন্য কত বকাবকি করি। যা বললে—অমনি পকেট থেকে দিয়ে দিলে! কেন যে বকি তা কি করে বুঝবে? ঠাকুর যখন সংসার পাতিয়েছেন, তখন সংসারীরা এখানে এসে শিখে যাবে—কি করে সংসার করতে হয়।''

''ভক্তদের রক্ত জল করা পয়সা। তারা ঠাকুরের নামে দিচ্ছে—তোমাকে আমাকে দেখে তো দিচ্ছে না। অতএব আমাদের কর্তব্য—কি করে একটা পয়সা বাঁচাতে পারি।''[২৫]

''আগে আগে একটি মুড়ি নষ্ট করলে সেদিন তার খাবার চাল নিতুম না। ভিক্ষার জিনিস কখনও নষ্ট করতে আছে? কত কষ্ট করে লোকেরা দেয়—সর্বদা সেটি মনে রাখবে। তাদের ত্যাগও কম নয়।''[২৬]

এই প্রসঙ্গেই মহারাজ স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন, ত্যাগই আদর্শ : ''এই দেখ, ম—বহরমপুরে চাল আদায় করত, সকাল থেকে দুটি মুড়ি খেয়ে থাকত, বিকেলবেলা কাঠের ধোঁয়ায় চোখের জলে মুখের জলে ভিক্ষের চালের সঙ্গে একটি আলু সিদ্ধ করে খেত। তার কষ্ট দেখে কলেজের ছেলেরা বললে—আমরা চাল তুলে দেব, সব ব্যবস্থা করে দেব—আপনি আমাদের হাঁড়ি দিয়ে যান। এই দেখ—ঐ ত্যাগটুকু দেখলে তাই তো এগিয়ে এল''।[২৭]

এই ত্যাগ আর সেবাই সঙ্ঘের আদর্শ : ''যুধিষ্ঠিরের অশ্বমেধ-যজ্ঞে 'শক্তু ও বেজির গল্প' প্রমাণ করেছে ত্যাগ ও সেবাই শ্রেষ্ঠ যজ্ঞ, শ্রেষ্ঠ ধর্ম। নিজের স্বার্থটা ত্যাগ, আর আত্মবুদ্ধিতে সবার সেবা, দয়া নয়। এই তো কর্মযোগ—এরই নাম সেবাধর্ম। উপায়ও যা, উদ্দেশ্য তাই। সেবায় চিত্তশুদ্ধি, সেবায় হৃদয়ের বিস্তার, সেবায় সর্বভূতে আত্মদর্শন।''[২৮]

সঙ্ঘের এক-একটি আশ্রম কত কষ্ট করে গড়ে ওঠে। তারপর যখন ধীরে ধীরে প্রাচুর্য আসে, তখন আশ্রমবাসীরা তুচ্ছ বিষয়ে মন দেয় না। সেদিকে অখণ্ডানন্দজী আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন : ''বৈদান্তিক পরমহংস তো হওনি এখনও—যে, পেলাম খেলাম, না পেলাম না খেলাম—তা যতক্ষণ না হচ্ছে, ততক্ষণ সব জিনিসের যত্ন নিতে হবে। যারা নিজের রক্ত দিয়ে, জীবন দিয়ে একটা আশ্রম গড়ে, তাদের ধরনই আলাদা। গড়া বড় শক্ত। কত পুরুষকার চাই।... আগে কি করেছি জানো? এ-মাঠে ও-মাঠে শুকনো কাঠ, বাঁশ, গোবর কুড়িয়ে জড় করে রাখতাম। বিকেলবেলা সবাই গিয়ে নিয়ে আসতাম।... আমি দুবছর ছিলাম না—এসে দেখি বাবুরা গাড়ী গাড়ী কয়লা কিনে রেখেছেন, আর কোন কষ্ট নেই। আশ্রমে গরু আছে, তবু ঘুঁটে-গোবর কেনা হচ্ছে। আশ্রমের মাঠে যা গোবর পড়ে, তা হয় বাইরের লোক নিয়ে যাচ্ছে, না হয় শুকিয়ে শুকিয়ে মাঠ নোংরা হচ্ছে, সে-সব দিকে কারও খেয়াল নেই।''[২৯]

সঙ্ঘের ঠাকুরপূজা ভাবের সঙ্গে করতে বলতেন অখণ্ডানন্দজী : ''পূজো? শুধু পূজো আর কতটুকু কাজ? ও আর বেশি বাড়িয়ে লাভ নেই। নিগম পূজো করত—একটি কৃষ্ণকলি ফুল দিত পাঁচ মিনিট ধরে। দু-ঘণ্টা লেগে যেত ফুল দিতেই। এদিকে ঠাকুরের সামনে জলখাবার সাজানো—ঠাকুরের খাওয়া হচ্ছে না। সেদিকে খেয়াল নেই। পূজোর সব কাজটাই পূজো—ঘর ঝাঁট দেবে, ঘর মুছবে, বাসন মাজবে, ফুল তুলবে, ফুল সাজাবে, ফল কাটবে, ফল সাজাবে—সব কাজ করবে পূজোর ভাবে। সঙ্গে সঙ্গে সর্বদা ইষ্টমন্ত্র জপ করবে, আর ইষ্টচিন্তা করবে।

''তারপর পূজো? অঞ্জলি অঞ্জলি ফুল দেবে,

বলবে, 'এই নাও, প্রভু, ফুল নাও।' চন্দন পরিয়ে দেবে, মালা থাকলে মালা পরিয়ে দেবে, গুটিদুচ্চার ফুল ছবির পাশে সাজিয়ে দেবে। আরও যতগুলি ছবি আছে—সবগুলিতে দুটি একটি ফুল দেবে—তারপর ঠাকুরকে জলখাবার দেবে—নিবেদন করে বলবে, 'খাও, প্রভু, এই তোমার খাবার। আজ যা পেয়েছি, তাই দিয়েছি। খাও ঠাকুর'। এই বলে দরজা বন্ধ করে বাইরে এসে একটু জপ করবে, আর ভাববে—ঠাকুর যেন খাচ্ছেন। এই তো পুজো। শরৎ মহারাজ শিখিয়ে দিয়েছিলেন, বাণলিঙ্গে সব ঠাকুর-দেবতার পূজো হয়, খুব সহজে হয়।"[৩০]

মহারাজ আরও বলতেন, ''মা, নাও, মা, খাও; মা, পর—এই তো পূজো। মন্ত্র-টন্ত্র আর কি? ঠাকুরের অত সংস্কৃত মন্ত্র-টন্ত্র ছিল না। খুব প্রাণ থেকে বলতে হয়—'মা, এই নাও; তোমারই জিনিস তোমাকে দিচ্ছি। কত ভক্ত আজ তোমায় কত ভালো ভালো জিনিস দিচ্ছে। আমি যা পেয়েছি, এনেছি; আর তো কিছু পাইনি। তুমি নিজগুণে নাও, মা।' কেঁদে কেঁদে বলবে, আর মনে করবে যেন তিনি প্রসন্না হয়ে সব নিচ্ছেন।

''আর হোম করবে—যেন সর্বস্ব আহুতি দিচ্ছ। ২৮টি বেলপাতা মায়ের নাম বলে বলে দেবে। তা নইলে সারাদিন মায়ের পূজো হচ্ছে, এদিকে মায়ের ছেলেরা সব না খেয়ে শুকুচ্ছে, আর ওদিকে মায়ের ভোগই নামছে না। আমাদের মা এরকম চাইতেন না। ভাবের পূজো—বুঝলে?"[৩১]

সঙ্ঘের আর একটি আদর্শ—"Exchange of ideas—exchange of men"। এ-সম্বন্ধে আমেরিকায় প্রচাররত স্বামীজীর শিষ্য স্বামী পরমানন্দকে অখণ্ডানন্দজী লিখেছেন, ''স্বামীজী চাহিয়াছিলেন exchange of ideas—exchange of men। তিনি নিজে ৩-৪ জনকে এদেশে আনিয়াছিলেন, ৩-৪ জনকে ওদেশে পাঠাইয়াছিলেন; কিন্তু তারপর? আমরা তো আমাদের ২০টি বিদ্বান বুদ্ধিমান যুবককে ওদেশের সেবায় পাঠাইয়াছি, ওদেশ সেই অনুপাতে কয়জন সেবক পাঠাইয়াছে? অতএব পরমচৈতন্য (পরমানন্দজীর পরিচিত মি. ফিলিপস) যদি এখানে থাকিয়া কাজ করে, তাহাতে ক্ষতি কি? সে practical এবং যন্ত্রবিদ্। এদেশে এরূপ লোকেরই প্রয়োজন।"[৩২]

সঙ্ঘের আর একটি মহৎ আদর্শের প্রতি সাধুভক্তদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে সাবধানবাণী উচ্চারণ করেছেন অখণ্ডানন্দজী : ''স্বামীজী আমাদের বারবার মনে করাইয়া দিতেন, গোপনে কৃত ছোট কাজই মানুষের চরিত্রের মাপকাঠি। বড় বড় কাজ করিবার ইচ্ছা অনেক সময় অহঙ্কার বাড়াইয়া তোলে এবং ধ্বংসের কারণ হয়। অতএব খুব একটা বড় করিয়া জনসাধারণের সামনে নিজেকে জাহির করিবার কথা চিন্তাও করিও না। সুখ্যাতি বা উৎসাহের জন্য মানুষের মুখের দিকে তাকাইও না; উদ্দীপনা, নির্দেশ ও উৎসাহের জন্য সর্বদা ভগবানের দিকে চাহিও। শহরে হৈ-চৈ-সহ কিছু একটা করিয়া লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ ও সুখ্যাতি অর্জন করা কঠিন নহে। উহা অপেক্ষা বড় এবং আরও অনেক বেশি প্রয়োজনীয় কাজ আছে, যে কাজে তোমার কেহ প্রশংসা করিবে না, উৎসাহ দিবে না, এমনকী সাহায্যও করিবে না, আর যেখানে দুর্দশা ও দুঃখভোগের সীমা নাই। যাও, তোমরা সেইখানে এবং তোমাদের জীবনের ও সাধনার সবটুকু সেইখানেই নিয়োগ কর। শ্রীগুরু মহারাজ ও স্বামীজীর নিকট হইতে তোমরা যেটুকু আলো পাইয়াছ, সেইটুকু ঢালিয়া দাও—অন্ধকারের কোণে কোণে। তোমরা পথ করিয়া দিয়া যাও, যেন পরবর্তীরা তোমাদের অনুসরণ করিতে পারে। তবেই বলিব, তোমরা স্বামীজীর চিন্তাশক্তির ধারা ধরিতে পারিয়াছ এবং তাঁহার অসমাপ্ত কাজে আত্মনিয়োগ করিয়াছ।"[৩৩]

বেলুড় মঠে শ্রীরামকৃষ্ণ-মন্দির স্বামীজীর

ভাবনায় তৈরি হয়েছে। নীলাম্বর মুখার্জির বাড়িতে যখন মঠ, সেই সময় মন্দিরের স্থান, শিল্প-সমাহার প্রভৃতি বিষয়ে স্বামীজী অখণ্ডানন্দজীর সঙ্গে সবিস্তারে আলোচনা করেছিলেন। স্বামীজীর ইচ্ছা ছিল ''শ্রীশ্রীঠাকুরের বেদির উপরে হীরা, চুনী, পান্নাখচিত সমুজ্জ্বল ওঁকার থাকবে।'' এতে ঘোরতর আপত্তি ছিল অখণ্ডানন্দজীর। কিন্তু স্বামীজী তাঁকে বুঝিয়েছিলেন 'নবযুগের ক্রমাভিব্যক্তির' কথা।

শ্রীমন্দিরের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন দ্বিতীয় সঙ্ঘাধ্যক্ষ স্বামী শিবানন্দজী মহারাজ, ১৯২৯ সালের ১৩ মার্চ—শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মতিথিতে। পুণ্য অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন স্বামী বিজ্ঞানানন্দজী, অভেদানন্দজী, মাস্টার মহাশয় সহ শ্রীরামকৃষ্ণের অপর শিষ্যগণ। কিন্তু অসুস্থতার দরুন অখণ্ডানন্দজী উপস্থিত হতে পারেননি। তবে মঠে তিনি একটি প্রতিবেদন লিখে পাঠান, যা 'উদ্বোধন' পত্রিকার একত্রিশ তম বর্ষ জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। তিনি লিখেছিলেন : ''[স্বামীজী] প্রথমেই বলিলেন, 'এই Renaissance-এর একটা বৈশিষ্ট্য আছে। অতীতকালে যেমন পৃথিবীর সকল জাতির অভ্যুদয়ের সঙ্গে art-এর বিকাশ হয়েছিল, তেমনি এই নবযুগেরও উপযোগী শিল্প প্রভৃতির সকল অঙ্গেরই বিকাশ অবশ্যম্ভাবী।' ''[৩৪]

শ্রীরামকৃষ্ণ জন্মশতবর্ষে সঙ্ঘের অধ্যক্ষ ছিলেন অখণ্ডানন্দজী মহারাজ। শতবর্ষ উৎসব উপলক্ষ্যে সঙ্ঘাধ্যক্ষের শুভেচ্ছাবাণী প্রয়োজন। তিনি দেবেন না, মঠ কর্তৃপক্ষও ছাড়বেন না। শেষে একদিন তিনি রাতে শ্রীরামকৃষ্ণের কণ্ঠস্বর শুনতে পান : ''লেখ, এই লেখ।'' তৎক্ষণাৎ উঠে তিনি সেগুলি লিপিবদ্ধ করেন। মহারাজ তাঁর বাণীর শেষ অংশে শ্রীরামকৃষ্ণের আগমন সম্পর্কে সঙ্ঘের মনোভাবটি জগদ্‌বাসীকে শুনিয়েছেন : ''প্রভুর সর্বধর্মসমন্বয় ও ধর্ম কর্ম জ্ঞান ভক্তি ও রাজযোগের অপূর্ব সমীকরণের প্রভাবে মানবজাতি জ্ঞাত ও অজ্ঞাতসারে মুক্তি-পথে অগ্রসর হইতেছে। পরে এমন দিন আসিতেছে, যখন জগতে এক সার্বভৌম শান্তিরাজ্যের প্রতিষ্ঠা এবং প্রভুর আহ্বানে সকল প্রকার বিবাদ-বিসংবাদ বর্জিত, উদ্বুদ্ধ ও সত্যবদ্ধ আপামর জনসাধারণ সমস্বরে প্রভুর 'যত মত তত পথ' বাণীর জয় ঘোষণায় রত এবং নবযুগের পতাকামূলে সমবেত হইবে। তখনই প্রভুর আগমনের মাধ্যন্দিন প্রভায় সমগ্র জগৎ আলোকিত হইবে। আজ এই মহা শুভদিনে ধরাবাসী সকলে প্রভুর 'আগমনের' অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিয়া ধন্য হউক, ইহাই আমার আকুল প্রার্থনা।''[৩৫]

সঙ্ঘের এক-একটি শাখাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হতে দীর্ঘ সময় লাগে। শ্রীশ্রীঠাকুরের উপর নির্ভরশীল হয়ে আশ্রমিকদের পরিশ্রম করতে হয়। অখণ্ডানন্দজী তাঁর প্রতিষ্ঠিত সারগাছি আশ্রম সম্বন্ধে স্বামী তুরীয়ানন্দ মহারাজকে লিখেছেন (১৬।১১।১৯১৫), ''আমার 'Mission Work' কেবল নিরক্ষর, নিরন্ন চাষাভুষোদের জন্যই। তাহা না হইলে আমিই বা এই দীর্ঘকাল এই এক পাড়াগাঁয়েই প্রাণপণ করিয়া পড়িয়া আছি কেন?... শ্রীশ্রীঠাকুরের কৃপায় যখন এই ১৮/১৯ বৎসর কাল এই আশ্রম হইতে নানারকমে, বহুতর নিরক্ষর দরিদ্র চাষাভুষোর অল্পবিস্তর উপকার হইয়াছে ও হইতেছে তখন ইহা যথাসময়ে সুপ্রতিষ্ঠিত হইবেই।... আমি শ্রীশ্রীঠাকুরেরই ইচ্ছায় এবং তাঁহারই নাম স্মরণ করিয়া যে ভাবে ভাবিত হইয়া এই দীর্ঘকাল এই কঠোর পরিশ্রম করিতেছি, তাহা কখনই নিষ্ফল হইতে পারে না।''[৩৬]

সঙ্ঘের সেবাধর্মের আদর্শ সম্বন্ধে অখণ্ডানন্দজী মহারাজের সুস্পষ্ট ভাব (৩১।০৭।১৯৩৪) : ''ভারতে আমাদের 'মঠ মিশন'ই সেবাধর্মের অগ্রণী এবং সাধারণে আমাদের ওই দিকটাই বেশ বুঝিতে পারে এবং 'সঙ্ঘের' উহাই মুখ্যাঙ্গরূপে সর্বত্র বিদিত। কেবল ধ্যান, ধারণা ও জপতপের দ্বারা

'মিশনে'র এই প্রতিপত্তি লাভ সম্ভবপর হইত না।"[৩৭]

সঙ্ঘের মঠ বা মিশনের যে-কোনও আশ্রমের ইতিহাসবৃত্ত লিখে প্রকাশ করা উচিত, কারণ সাধুভক্ত সকলেই এই ইতিহাস পড়ে উজ্জীবিত হবেন। অখণ্ডানন্দজীও এর গুরুত্ব উপলব্ধি করে মাধবানন্দজীকে লিখে জানিয়েছিলেন (২০।০১।১৯৩১) যে, সারগাছি আশ্রমের সংক্ষিপ্ত কার্যবিবরণী ও সেবাধর্মের ইতিবৃত্ত লিখে তাঁর প্রকাশ করার ইচ্ছা রয়েছে।[৩৮]

সঙ্ঘের প্রধান অঙ্গ সেবাকাজ—একথা বারবার অখণ্ডানন্দজী বলেছেন। যখন তিনি মহুলাতে দুর্ভিক্ষে সেবারত, তখন স্বামীজীর 'আশাপ্রদ উৎসাহপূর্ণ পত্র' তাঁর ভিতর শক্তি সঞ্চার করত। 'স্মৃতিকথায়' তিনি লিখেছেন, ''তাঁহার প্রত্যেক পত্র বারংবার পড়িতে পড়িতে নববলে বলীয়ান হইয়া 'মন্ত্রং বা সাধয়েয়ং শরীরং বা পাতয়েয়ম্' মন্ত্রে আমার বুক ভরিয়া যাইত। ওঃ, কি অনাবিল কর্মস্রোতে আমি তখন মগ্ন হইয়া থাকিতাম। মনে হইত, আমাদের এই সাধনার ফলে অচিরকাল মধ্যেই এক অভূতপূর্ব নবীন যুগের অভ্যুদয় হইবে।"[৩৯]

সঙ্ঘের সেবাব্রত যাতে কখনও অর্থের অভাবে ব্যহত না হয়, সেজন্য অখণ্ডানন্দজী শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে প্রার্থনা করতেন। এটিও সঙ্ঘের একটি ভাব। এই ভাবটি তিনি আমেরিকায় প্রচাররত স্বামী অখিলানন্দজী মহারাজকে লিখেছেন (১৬।৯।১৯৩৪) : ''অকূলের কাণ্ডারী বিপদভঞ্জন ঠাকুরের কাছে ব্যাকুল অন্তঃকরণে এই প্রার্থনা করিয়াছি যে, ঠাকুর! তোমার 'সেবা ভাণ্ডার' যেন সদাকাল অফুরন্ত থাকে।... বিপন্ন নর-নারায়ণের ঘরে২ [ঘরে ঘরে] আমাদের ঠাকুর ঘর। অন্নবস্ত্র ও সহায় সম্বলহীন নর-নারায়ণের কিঞ্চিৎমাত্র সেবাতেই আমাদের ঠাকুরের ঘরে২ [ঘরে ঘরে] ষোড়শোপচারে পূজা হয়।"[৪০]

অখণ্ডানন্দজী সঙ্ঘের রিলিফের কাজকে 'মুখ্যাঙ্গ' বলে মনে করতেন। এই কাজ সদা অব্যাহত রাখার জন্য তিনি একটি 'Permanent Fund'-এর কথাও বলেছেন। মহাসমাধির দুবছর আগে তিনি তাঁর মনের কথা অখিলানন্দজীকে লেখা পত্রে (১৯।৮।১৯৩৪) ব্যক্ত করেছেন : ''দেশের ঘোরতর নিত্য বিপদ ও মিশনের fund-এর দৈন্যদশা দেখিয়া, আমি অনেক চিন্তার পর এই স্থির করিয়াছি যে, স্বামীজীর অভীপ্সিত শ্রীমন্দিরের মালমশলার estimate কিছু কমাইয়া—'Relief Work'-এর জন্য একটা Permament Fund করিয়া দিলে, আমরাই 'টেক্কা' দিয়া সর্ব্বাগ্রে সেবানুষ্ঠানের ব্যবস্থা করিতে পারিব।"[৪১]

কয়েক মাস পর আবারও তাঁকে লেখেন (২।২।১৯৩৫), ''Relief Work-এর জন্য একটা স্থায়ী মোটা রকম আমানত রাখিবার নিতান্ত প্রয়োজন হইয়াছে। অতঃপর তুমি টাকাকড়ির সুবিধা হইলে—ঐ বাবদ যদি দিতে পার তো আমি নিঃসন্দেহে লিখিতেছি যে, তাহা শ্রীশ্রীঠাকুরের ইচ্ছামত কার্য্যই হইবে।... ঠাকুরের ইচ্ছায় অসম্ভবও সম্ভব হয়।"[৪২]

তখন শ্রীশ্রীঠাকুরের মন্দির নির্মাণের তোড়জোড় হচ্ছিল। অখিলানন্দজীর উৎসাহে ও উদ্যোগে প্রয়োজনীয় অর্থ জোগাড় প্রায় হয়েছিল। ওই প্রস্তাবিত অর্থের কথাই অখণ্ডানন্দজী লিখেছিলেন। তবে মন্দিরের অর্থে হাত দিতে হয়নি। তাঁর দুটি ইচ্ছাই শ্রীরামকৃষ্ণের কৃপায় পূরণ হয়েছিল। তিনি শুধু জেনে যেতে পারেননি। অখিলানন্দজীর সংগৃহীত অর্থেই শ্রীমন্দির নির্মিত হয়েছিল। আরও অনেক পরে সঙ্ঘের 'Permament Relief Fund' গঠিত হয়েছিল। যে-কোনও সময়ে, যে-কোনও স্থানে, যে-কোনও বিপর্যয়ে সঙ্ঘের ওই স্থায়ী তহবিলের সুদে রিলিফ কাজ আরম্ভ করা হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণের সব পার্ষদদের মতোই

অখণ্ডানন্দজী মহারাজের জীবনও ছিল সঙ্ঘময়। সঙ্ঘের ভাব ও আদর্শগুলি তাঁর প্রতি কাজে, প্রতি পদক্ষেপে, প্রতি চিন্তায়, প্রতি নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসে প্রতিফলিত হত। প্রতি কাজে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের নির্দেশ পেতেন। সঙ্ঘ মানেই শ্রীরামকৃষ্ণ। স্বামীজী কথিত সঙ্ঘের প্রত্যেক অঙ্গ শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতিনিধি। আপামর নরনারী তাঁদের মধ্য দিয়েই ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণকে দর্শন করবেন। অখণ্ডানন্দজী মহারাজকে দেখে মানুষ শ্রীরামকৃষ্ণকে পেয়েছিলেন এবং সঙ্ঘস্বরূপ শ্রীরামকৃষ্ণের ভাব ও আদর্শকে জেনেছিলেন। তাঁর মাধ্যমেই ইংরেজ শাসকবর্গ ও উচ্চপদাধিকারী রাজকর্মীরা সঙ্ঘের সেবাকাজে যুক্ত হয়েছিলেন, সঙ্ঘের আদর্শ অনুধাবন করতে পেরেছিলেন।

সঙ্ঘের আদর্শকে রূপায়িত করার জন্য অখণ্ডানন্দজী মহারাজ ওই অখ্যাত, অজ্ঞাত গ্রামে নরনারায়ণ সেবায়, 'চৈতন্যময়' শিবের সেবায় তিলে তিলে নিজেকে বিলিয়ে দিয়েছিলেন। প্রায় সাঁইত্রিশ বছর তিনি নিজের প্রতি রক্তবিন্দু দিয়ে সঙ্ঘের ভাব প্রচার করেছেন।

অখণ্ডানন্দজী মহারাজের কাছে তাঁর অনাথ ছেলেরা ছিলেন সাক্ষাৎ নারায়ণ। তাঁদেরকে স্নান করাতেন নারায়ণের স্নানের মন্ত্রে। সকল মানুষের মধ্যে দেখতেন সাক্ষাৎ শ্রীরামকৃষ্ণকে। তাই তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ মন্দির করেননি। তাঁর কাছে রিলিফ ক্যাম্প, দাতব্য চিকিৎসালয়, অনাথ আশ্রম, বিদ্যালয় ও শিক্ষাকেন্দ্রগুলিই ছিল মন্দির। যদিও ভক্তদের একান্ত অনুরোধে একটি দোতলা বাড়ির উপরেই হয়েছিল শ্রীরামকৃষ্ণ মন্দির। এই মন্দিরে কোনও চূড়া নেই, চাকচিক্য নেই—একেবারে সাদামাটা অতি ছোট মন্দির। শুধু বাড়ির বাইরের দেওয়ালে জ্বলজ্বল করছে 'ওঁ শ্রীরামকৃষ্ণ'। ১৯২৮ সালে শ্রীশ্রীঅন্নপূর্ণাপূজার দিনে শ্রীরামকৃষ্ণ মন্দির উৎসর্গীকৃত হয়। অখণ্ডানন্দজীর মুখের কথায় : ''ঠাকুরই আমায় জানিয়ে দেন, এখানে ব্যষ্টিরূপে তিনি অন্নপূর্ণা! তাই, কি আশ্চর্য! শ্রীমন্দিরের সকল কাজ ঠিক সেই অন্নপূর্ণা-পূজার পূর্বদিনেই শেষ হল। এ-দিনের নাম শুনলেই আমার রোমাঞ্চ হয়।''[৪৩]

মন্দির উৎসর্গের দিন আরাত্রিক ভজন হয়ে গেছে। আশ্রমবাসীরা অখণ্ডানন্দজী মহারাজকে ঘিরে ধরে বসে আছেন। তিনি ভাবাবস্থায় বলতে লাগলেন : ''সারগাছি মহাতীর্থ হয়ে গেল। এবার থেকে দলে দলে সব আসবে। আমার ৩২ বছরের সাধনা পূর্ণ হল। ঠাকুর এই পাড়াগাঁয়ে নিজেই বসলেন। সামান্য ধূলোখেলার ঠাকুরঘর থেকে এত বড় মন্দির হল। ধন্য প্রভু, ধন্য তোমার লীলা! যত দিন যাবে, আরও কত দেখাবে! সমষ্টিভাবে শ্রীরামকৃষ্ণরূপে শুক্লা দ্বিতীয়ায় তাঁর আবির্ভাব, ব্যষ্টিরূপে অন্নপূর্ণারূপে এখানে তিনি এই দিনে প্রকাশিত।''[৪৪]

মন্দির প্রতিষ্ঠার সংবাদে দ্বিতীয় সঙ্ঘগুরু শিবানন্দজী মহারাজ লিখেছিলেন, ''ঠাকুর সারগাছিতে চাষাভুষোদের উদ্ধার করবার জন্য স্বয়ং অধিষ্ঠিত হয়েছেন—ইহাতে সন্দেহের কিছুমাত্র কারণ নাই। ঠাকুর তোমার সঙ্গে সঙ্গে রয়েছেন।''[৪৫]

সঙ্ঘরূপী শ্রীরামকৃষ্ণের সেবাব্রত মাত্র চারআনা দিয়ে আরম্ভ হয়েছিল কয়েকটি দুর্ভিক্ষপীড়িত বালক-বালিকার মাধ্যমে। আজ প্রায় একশো পঁচিশ বছর ধরে অখণ্ডানন্দজী মহারাজের প্রাণের আশ্রম সারগাছিকে কেন্দ্র করে ওই অঞ্চলে সঙ্ঘের ভাব ও আদর্শ চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়েছে। এই ভাব ও আদর্শের মুখ্যাঙ্গ সেবাকাজ বিস্তৃত থেকে বিস্তৃততর হয়েছে, হচ্ছে ও ভবিষ্যতে হবে। এখানেই সঙ্ঘের মহিমা, সঙ্ঘের প্রয়োজনীয়তা। স্বামী বিবেকানন্দের স্বপ্নের সঙ্ঘের প্রথম অগ্নিস্ফুলিঙ্গ জ্বেলে দিয়েছিলেন স্বামী অখণ্ডানন্দ। তিনি নিজের জীবন দিয়ে দেখিয়ে গেলেন সঙ্ঘই শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীরামকৃষ্ণই সঙ্ঘ।

তথ্যসূত্র

১। স্বামী সারদানন্দ, *শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ* (উদ্বোধন কার্যালয় : কলকাতা, ১৩৮০), ভাগ ১, সাধকভাবের শেষকথা, পৃঃ ৩৭৬-৩৮০

২। সম্পাদনা : স্বামী ঋতানন্দ, *স্বামী ভূতেশানন্দ, শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবপ্রভা* (উদ্বোধন কার্যালয়, ২০১৭), খণ্ড ১, পৃঃ ৪০৪

৩। স্বামী অন্নদানন্দ, *স্বামী অখণ্ডানন্দ* (উদ্বোধন কার্যালয় : ১৯৮২, পৃঃ ৯৩, ১০০) [এরপর, *স্বামী অখণ্ডানন্দ*]

৪। সংকলন : স্বামী চেতনানন্দ, *স্বামী অখণ্ডানন্দকে যেরূপ দেখিয়াছি* (উদ্বোধন কার্যালয় : ১৯৯৯), পৃঃ ৪৩ [এরপর, *স্বামী অখণ্ডানন্দকে যেরূপ দেখিয়াছি*]

৫। স্বামী অখণ্ডানন্দ, *স্মৃতি-কথা* (উদ্বোধন কার্যালয় : ১৩৭৯), পৃঃ (৩০) [এরপর, *স্মৃতি-কথা*]

৬। তদেব, পৃঃ (১১)

৭। তদেব, পৃঃ (১৫)

৮। তদেব, পৃঃ (২৬)

৯। দ্র : তদেব, পৃঃ ১৫০

১০। তদেব, পৃঃ ১৯৯-২০০

১১। *স্বামী অখণ্ডানন্দকে যেরূপ দেখিয়াছি*, পৃঃ ৪৭

১২। তদেব, পৃঃ ৫০

১৩। তদেব, পৃঃ ৫৩

১৪। তদেব, পৃঃ ৬৮

১৫। তদেব, পৃঃ ১০০

১৬। সম্পাদনা : স্বামী ঋতানন্দ, *স্বামী অখণ্ডানন্দের পত্রসমগ্র* (উদ্বোধন কার্যালয় : ২০১৫), পৃঃ ১০৫-১০৬, [এরপর, *পত্রসমগ্র*]

১৭। *স্বামী অখণ্ডানন্দ*, পৃঃ ২৪৯

১৮। তদেব, পৃঃ ২৫৬

১৯। তদেব, পৃঃ ২৮০

২০। *পত্রসমগ্র*, পৃঃ ১৮৯

২১। তদেব, পৃঃ ২৩৬-২৩৭

২২। তদেব, পৃঃ ৩৭৯

২৩। স্বামী নিরাময়ানন্দ, *স্বামী অখণ্ডানন্দের স্মৃতিসঞ্চয়* (উদ্বোধন কার্যালয় : ২০১৪), পৃঃ ৪ [এরপর, *স্মৃতিসঞ্চয়*]

২৪। তদেব, পৃঃ ৪৫

২৫। তদেব, পৃঃ ৩২

২৬। তদেব, পৃঃ ৮২

২৭। তদেব

২৮। তদেব, পৃঃ ৭০

২৯। তদেব, পৃঃ ৮২-৮৩

৩০। তদেব, পৃঃ ৮৭-৮৮

৩১। তদেব, পৃঃ ১০০-০১

৩২। তদেব, পৃঃ ১৩৬-১৩৭

৩৩। সংকলন ও টীকা সংযোজনা : মৃণাল গুপ্ত, *স্বামী অখণ্ডানন্দের রচনা সংকলন* (রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম, সারগাছি : মুর্শিদাবাদ, ১৪২৪) ,পৃঃ ২৫০ [এরপর, *রচনা সংকলন*]

৩৪। তদেব, পৃঃ ২৫২

৩৫। *Centenary of Sargachi Ramakrishna Mission Ashrama*, 1997, p. 145

৩৬। *পত্রসমগ্র*, পৃঃ ১২৫

৩৭। তদেব, পৃঃ ৩৫৫

৩৮। দ্রঃ তদেব, পৃঃ ২০৬

৩৯। *স্মৃতিকথা*, পৃঃ ২৩০

৪০। পত্রসমগ্র, পৃঃ ৩৭১

৪১। তদেব, পৃঃ ৩৫৯

৪২। তদেব, পৃঃ ৪২০

৪৩। *স্বামী অখণ্ডানন্দ*, পৃঃ ২৬৪

৪৪। তদেব, পৃঃ ২৬৫

৪৫। তদেব

গ্রাহকের প্রতি

মে মাস থেকে পত্রিকার বছর শুরু। যে-গ্রাহকেরা এখনও নবীকরণ করেননি তাঁদেরও এই সংখ্যা দেওয়া হচ্ছে। তাঁদের অনুরোধ, অবিলম্বে আপনারা নবীকরণ করুন।